# প্রাক্‌কথন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির সঙ্গে ছেলেবেলাতেই পরিচয় হয়েছিল। সেই ভৃত্য ছিল প্রভু-অন্ত প্রাণ। কিন্তু নয়ের দশকের সূচনায় কলেজে পড়তে এসে পরিচয় হয় এমন পুরাতন ভৃত্যের সঙ্গে যে প্রকাশ্য রাস্তায় ছুরি দেখিয়ে অনায়াসেই মণিবের টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কিংবা শুধুমাত্র পণের টাকার লোভে নিজের পুত্রবধূদের এক এক করে ওষুধ দেওয়ার নাম করে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে কবিরাজ কৃষ্ণকান্ত সেন শর্মা।

এমন উল্টো করে মানুষকে দেখেছিলেন যিনি তিনি আর কেউ নন, রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী কথাকার জগদীশ গুপ্ত। অনার্সে তাঁর গল্পগুলি পাঠ্য থাকার সুবাদেই তাঁর লেখার প্রতি প্রথম আকর্ষণ জন্মেছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়তে এসে পড়ে ফেলি 'লঘুগুরু' 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'নিষেধের পটভূমিকা'য় কিংবা 'কলঙ্কিত তীর্থে'র মতো ব্যতিক্রমী ধারার উপন্যাস। একটা অন্যরকম ভালো লাগা তৈরী হয়ে জগদীশ গুপ্তের প্রতি। ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বিচিত্ররকম মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা লেখকের মতো তাঁর এই পাঠককেও অনেকটাই সমমেরুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। স্বভাবতই শিক্ষান্তে জীবন জীবিকার তাগিদে নেমে পড়ায় দীর্ঘকাল বুকের মধ্যে স্বপ্নটা কেবল লালন-পালন করেছি জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাগিশতা, রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদী ভাবনা, শরৎচন্দ্রীয় ভাবাবেগ কিংবা কল্লোলীয়দের যৌনতা নির্ভর নগ্ন বাস্তবতা থেকে একেবারে দূরত্বে অবস্থানকারী, আত্মপ্রচার বিমুখ এই লেখকের প্রতি নির্মল ভালোবাসাই আমাকে প্রনোদিত করেছে। আমার অগ্রজপ্রতিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায়, আমাদের প্রিয় নিখিলেশ দা'র হাত ধরে আমার সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হতে দীর্ঘকাল সময় লেগে গেল। তবুও তো শেষ রক্ষা হলো। আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভ তৈরী করতে পেরেছি জগদীশ গুপ্তের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সন্ধান বিষয়ে।

জীবনকে একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একজন প্রায় অনালোচিত স্রষ্টার উপন্যাসগুলির মধ্যদিয়ে তাঁর প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ করার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। আমার

আলোচনার ক্ষেত্রটিকে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি ভূমি।

তৃতীয় অধ্যায় : উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত।

চতুর্থ অধ্যায় : সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান।

পঞ্চম অধ্যায় : অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল।

ষষ্ঠ অধ্যায় : চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি।

সপ্তম অধ্যায় : উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা।

অষ্টম অধ্যায় : ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন।

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিলচন্দ্র রায়, তিনি দীর্ঘকাল ধরে আমার সঙ্গে নানাভাবে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা শুধু করেননি আমাকে বারবার তাগাদা দিয়েছেন কাজটি নিষ্পন্ন করার জন্য। কিন্তু কর্মব্যস্ততা আর পারিবারিক দায়বদ্ধতা বারবার আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে। আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে আমার মা-বাবার কথা। এই গবেষণার কাজ চলাকালীন যাঁদের আমি হারিয়েছি। প্রায় গুছিয়ে ওঠা পড়াশুনা আমার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সেই দিনগুলোর কথা মনে করে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবা আমার এই কাজ দেখে যেতে পারলেন না। এই শোকের কোনো সান্ত্বনা নেই। আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছে আমার স্ত্রী সীমা, পুত্র সোহম আর শাশুড়িমা, শ্যালক ও শ্যালকের স্ত্রী। ওরা আমার প্রতিদিনের কাজের প্রেরণা।

গবেষণার সূত্রেই যাঁদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. সুবোধকুমার যশ, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. দীপককুমার রায়, দর্শন বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. রঘুনাথ ঘোষ প্রমুখ। এঁরা নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাগাদা দিয়েছেন আমাকে। নানা পরামর্শ পেয়েছি এঁদের কাছে।

আমার কলেজের সহকর্মী ড. মৃণালকান্তি সিন্‌হা, ড. আবু সিদ্দিক, ড. আজিজ আহমেদ, ড. সুব্রত দেবনাথ; আমার বিভাগীয় সহকর্মী আশীষ, অলোক, সনাতন, প্রিয়াংকা এরা সকলেই আমার কাজে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অধ্যক্ষ ড. হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য খোঁজখবর নিয়েছেন আমার কাজের অগ্রগতির। অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী আমার প্রেরণা। তারা চেয়েছে আমি কাজটি যেন শেষ করি। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়কের সহধর্মিণী শ্রীমতী তন্দ্রা বর্মণ, অগ্রজপ্রতিম মালদা টিটার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক আবদুল সালাম সমু, আমার ছাত্র জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ রায়, অগ্রজপ্রতিম মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ভগীরথ দাস; কোচবিহার বি.টি. এণ্ড ইভিনিং কলেজের অধ্যাপক ড. উত্তম দত্ত, ড. জয়দীপ সরকার; কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাস; মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক অনুজপ্রতিম শেখর সরকার—এমন অনেক গুণমুগ্ধ মানুষ আমার কাজের প্রেরণা যুগিয়েছে। সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ থেকেও সহযোগিতা পেয়েছি। বই সংগ্রহে সাহায্য করেছে গৌরীপুর আসাম, প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজের অধ্যাপিকা শিল্পী রায়, কলকাতা 'সোপান' পাবলিশার্স -এর জয়জিৎ মুখার্জি, যিনি 'লঘুগুরু' বিষয়ক আমার আলোচনা গ্রন্থটির (জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু : স্বতন্ত্র নির্মাণ) প্রকাশক; সেইসাথে উল্লেখ করতে হয় সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটির মুদ্রক প্রিয় বুবুন কুমার বর্মণ এবং প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র তুফান রায়। এরা আমার আপনজন। এদের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এই অভিসন্দর্ভ।

---

তাং : ০৯/১১/১৯

**(রঞ্জন রায়)**